লোকপ্রমোদে সুন্দরবনের আদিবাসী লোকগান

ড. সুভাষ মিস্ত্রী

আদি ভারতের এশিয়া - য়ুরোপীয় বহুধাবিচিত্র জীবনস্রোত সুন্দরবনের বৃহত্তর সমাজ মোহনায় এসে মিলিত মিশ্রণে গড়ে তুলেছে মিশ্র - জনসমাজ, সুন্দরবন লোকায়ত সমাজ। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরবনের জনগোষ্ঠী অসমগোষ্ঠীর ও নিষাদ - কিরাত দামিল নিগ্রোয়েত জাতিভুক্ত। এদের মধ্যে প্রব্রজিত দ্রাবিড়, মঙ্গল, আদি-অষ্ট্রালয়েড ভেডিউড ও নার্দিকগোষ্ঠী। বস্তুতপক্ষে, ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞানী নিরীক্ষায় সুন্দরবনের সমূহ জনজাতি গোষ্ঠীর পর্যায়ক্রম মূলত ত্রিবিধ :

প্রথমত, প্রাচীনবাংলার আদি - অধিবাসী হিন্দু তপশিলীভুক্ত জাতি ও তপশিলীভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায় পণ্ডুগল, পুণ্ড্র বা পৌন্ড্রক, ত্রিয় এবং অবর্ণ ও অনগ্রসর হিন্দু -সম্প্রদায় বিশেষ করে রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কাহার, নমঃশূদ্র (চাঁড়াল বা চণ্ডাল) মাহিষ্য, জেলে, কৈবর্ত, সূত্রধর, বাগ্দী, বৈদ্য, কাণ্ডার, মাহার, মালো, শুঁড়ি, তিয়র, মাঝি, চর্মকার বা ঋষিবর (মুচি), গোয়ালা (যাদব), নাপিত, ডোম, জেলার, সচ্চাষী, মোদক, কাপালিক, বেদে শঙ্খবণিক, নাথ, যুগী, পটুয়া সম্প্রদায় প্রভৃতি সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার জনসম্পদ।

দ্বিতীয়ত, জঙ্গল হাসিলপর্বে, বিহার, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, ছত্তিশগড়, নাগপুর, সুরজগড়, কেওনঝড়, ময়ুরভঞ্জ থেকে প্রব্রজিত বাদাবনের ভূমিঅধিকারী ভূমিজ, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, মাহাত খেড়িয়া, লোধা, খাসি, কোরা, তুরি, মহালি, প্রভৃতি 'বুনো' বা 'বনুয়া' অষ্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠী।

তৃতীয়ত, ভাগ্যান্বেষণে প্রব্রজিত বিহারীয় ও মুঙ্গেরীয় হিন্দুস্থানী, উত্তরপ্রদেশীয় কনৌজ ব্রাহ্মণ ও মাড়োয়ারী সম্প্রদায়, রাজপুতনার অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয় বা ঠাকুর সমপ্রদায় ও হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, ব্রাহ্মণ ও ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ, মুসলমান, কায়স্থ ও খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মাবলমম্বী, জাতি সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষের যে প্রান্ত থেকে যিনিই যে উদ্দেশ্যে আসুন না কেন তাঁরা তাঁদের সভ্যতা - সংস্কৃতিক মৌল উপাদান উপকরণ সমূহ বহন করে এনেছেন। বনুয়াগণ কিছুটা স্বতন্ত্র ধারা বজায় রাখলেও বহুলাংশে সুন্দরবনের পরিবেশ - প্রতিবেশের রসায়নে রূপলাভ করেছে 'সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি'।

(গ) সুন্দরবন অঞ্চলের লোকগানকে ত্রিবিধ পর্যায়ে বিভাজিত করা সম্ভব। প্রথমত প্ররজিত আদিবাসী উপজাতির নিজস্ব লোকগান। দ্বিতীয়ত, সুন্দরবনের লৌকিক দেবদেবী ও বিবি - গাজী, পীর-পিরানী মাহাত্ম্যকথার আখ্যানমূলক লোকগান। তৃতীয়ত, সুন্দরবনের জল-জঙ্গল - মাটির রসপুষ্ট বিচিত্রিত লোকগান।

প্রব্রজিত আদিবাসী উপজাতির নিজস্ব রস - পরাগে মূর্ত লোকগান :

পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছর গড়িয়ে যেতে না যেতেই সুন্দরবনের সুন্দরীবৃক্ষের জঙ্গল কেটে ভূমি উদ্ধার ও কাঠ সরবরাহের জন্য জঙ্গল ইজারা দেওয়া হয়। এ সময় থেকেই জঙ্গল হাসিল, জমির নিচের মুড়া উৎপাটন, নদীবাঁধ নির্মাণ, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য খাল, পুকুর, দিঘি, খননের কাজে ব্যবহার করা হয় সাঁওতাল, মুণ্ডাঁ, ওঁরাও, মাহাত, ভূমিজ, মহালি, খেড়িয়া, লোধা, খাসি, তুরী, কোরী, প্রভৃতি আদিবাসী শ্রমিকদের। বাদা অঞ্চলের প্রকৃত ভূমি অধিকারী হলেও এঁরা 'বানো', 'বনুয়া' কিম্বা 'সদ্দার' নামে পরিচিত এবং খানিকটা কলোনির মতো বসবাস করেন গ্রামের প্রান্তিক প্রদেশে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিবেশে এখনো কিছুটা গণতন্ত্রের অধিবাসী এই আদিবাসীদের আমদানি করা হয় বিহার, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম - সিংভুম, রাঁচি, হাজারিবাগ, ছত্তিশগড়, নাগপুর, সুরজগড়, কেওনঝড় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। 'আড়কাঠিয়া' বা 'গিরমিটের' মাধ্যমে কুলি করে। এঁরা জঙ্গল হাসিলের পাশাপশি লবণাক্ত দুরন্ত স্রোতধারাকে বন্দী করতেন বাঁধ বেঁধে। জমিদাররা ১০২ টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জনপদভূমি গড়ে তুলতে ৩৫০০ বর্গকিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেন। আর পর্যন্ত তার এক ইঞ্চিও বাড়েনি, সংস্করণ প্রয়াসও নেই; এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রসম্ভূত দেশগুলির মতো ব্যবস্থা গ্রহণ অনুপস্থিত। নদীবাঁধ বিনির্মাণে আদিবাসীদের শ্রমভিত্তিক মহৎ ভূমিকায় কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সুন্দরবনই এঁদের শেষ উপনিবেশ। এঁরা যে যেখান থেকেই আসুন - না - কেন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নান্দনিক প্রবাহ, নিজস্ব সম্প্রদায়ের পেশাভিত্তিক সামাজিক সংস্কার - বিশ্বাস, মন্ত্র - তন্ত্র, আচার - ব্যবহার অবসর বিনোদনমূলক খেলাধুলা, গান - বাজনা, প্রাণের সুর। সুন্দরবনের নদী - জঙ্গল নির্ভর আদিম পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীও সম্প্রদায়ের আনীত ভাবধারার সম্মেলনে তার কিছুটা হারিয়ে গেছে, কিছুটা বা রয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে অসম লড়াইয়ে প্রকৃতিরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থেকে গড়ে ওঠা জনজীবনের নূতন ভাবধারার সঙ্গে। প্রব্রজিত এই সমূহ মানুষের গান সুন্দরবনের নিজস্ব সম্পদে পরিণত।

মাটি কাটার গান :

'মাটি কাটার গান' নদীবাঁধ বা ভেড়ি নির্মাণের গান— একাধারে শ্রমসাধ্য, ক্লান্তি অপসারণ, মানসিক প্রসারতা, সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তি, সৌন্দর্যচেতনা ও একতাবদ্ধ যৌথ জীবনের কর্ম - প্রেরণাস্বরূপ। আদিবাসীদের সাবেক বাসভূমি কঠিন পার্বত্য বন্ধুর অঞ্চল। সুন্দরবন নদীমাতৃক পলিমাটির দেশ, লবণাক্ত জল আর ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে ভরা বাঘ—সাপ-কুমির ইত্যাদির সহাবস্থানের দেশ। এই জল আর জঙ্গলকে বন্দী করতে হয়েছে; অভ্যস্ত হতে হয়েছে নদীবাঁধ। 'কোদালিয়া' ও 'মুটে' অর্থাৎ ন্যূনতম দুই জন লোকের প্রয়োজন। কোদালিয়া 'কাঁধচাপড়া' বা 'হাতকাটালি' মাটি কেটে দেন সঙ্গীর হাতে, কাঁধে বা ঝুড়িতে করে তুলে দেন মাথায়। উক্ত মাটির সঙ্গীর হাত - কাঁধ - মাথা ফেরৎ চলে যায় বাঁধে। জলভূমি হয় বন্দী, দেখতে দেখতে সরু 'আল্পথ' রূপ পায় ভেড়ীতে। শক্ত বা নরম মাটির বুকে কোপ বসাতে যে পরিমাণ রক্ত শ্রমে ঝরে, কাঁধে বা মাথায় চাপড়া বা ঝুড়ি বহন করতে করতে যে ঘাম-মেহনত ব্যয়িত হয় তার অধিকাংশই অপনোদিত হয় গান গাওয়ার তালে, লয়ে। কোদালের কোপে মাটি কাটার হিঁস্-স্ সিঁস্-স্ ধ্বনিই বাদ্যধ্বনি বলা চলে। শ্রমে সংগীতে মূর্ত হয়ে ওঠে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছন্দোময় সংহতি। একটি মাটি কাটার গান— 'মাটিকাটা ও বড়ি বিষমরে কাম/ যেসব দাম তেসম কাম।/ খাল চাপাও যোগা বুঝাও/ তবে ঘর ঘাঁউ তবে পান্তা খাঁউ।/ কোদাইল উলটালা কি পালটালা—/ব্যাঙরানী গীতগাহেলা/ কোদাইল মাদল বাজাল।— অর্থাৎ মাটিকাটা বড় কষ্টের, যেমন দাম তেমন কাজ। নিচু জায়গা ভর্তি করে গর্ত বুজিয়ে তারপর বাড়ি গিয়ে পান্তা ভাত খাও। কোদাল উল্টাচ্ছে পাল্টাচ্ছে ব্যাঙরানী গান গাইছে, আর মাদল বাজার কাজ করছে' মাটিকাটার শব্দ। সুন্দরবনের পরিবেশে শ্রুত এ-এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

সঁওরাই গান :

'সঁওরাই' বা 'সহরাই' অর্থে কার্তিক মাস বোঝালে কার্তিকী অমাবস্যায় গোয়ালপূজার গানই 'সঁওরাইগান'। আদিতে গোরুর নাচই ছিল মুখ্য। সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 'বাঁধনা পরব' বা গোরু নাচানো উৎসব হয়ে থাকে। বাঁদনা পরবের গান 'অহীরা গীত' বা 'আহির'। হিন্দী আহির অর্থে গোয়ালা। গোয়ালার নিটোল শক্তিশালী কোনো বলদকে দড়িতে বেঁধে তার সামনে নানা অঙ্গ - ভঙ্গিসহ মাদল বাজিয়ে উদ্‌বুদ্ধ করে, নাচায় আর 'আহীরা গীত' পরিবেশন করে।

আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বস্তুবিষয় মান্য ও পবিত্রতাসূচক। গোরু, গো-গৃহ বা গোয়ালও। ভারতবর্ষে সর্বত্রই গো - পূজা প্রচলিত। গোরু দেবতাসূচক হওয়ায় গোশালাও পবিত্র স্থান, পূজ্য। গোয়াল পূজাই গোরুপূজা। ভাদ্রের 'গোমা' পূর্ণিমা তিথি ও কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে গোয়ালপূজা বা গোরুপূজা হয় সুন্দরবনে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গোয়ালপূজা রাত্তির তৃতীয় বা চতুর্থ প্রহরে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বাঙালি সম্প্রদায়গণ গোয়ালপূজা করেন পাঁজির দিন - ক্ষণ মিলিয়ে। ভালোমতো গোয়াল ঝেড়ে - মুছে - ধোয়া হয়। দুদিকে দুধারে বসানো হয় কলাগাছ ও মঙ্গলঘট। সমস্ত গোরু - বাছুর তেল - হলুদ - সিঁদুর মাখিয়ে স্নান করানো হয়। তবে গোয়ালের শ্রেষ্ঠ গোরুই পূজা পেয়ে থাকে। নিখুঁত - নিটোল গরুর শিং-লেজ-পিঠ সরষের তেল ও হলুদ মাখিয়ে, কপালে সিঁদুর টিপ দিয়ে গলায় পরানো হল শালুক ফুলের মালা। বেল ও আমপাতার মালা। তিন - পাঁচ - সাতবার প্রদক্ষিণ করার সময় গোরুর পায়ে পায়ে জল দিয়ে প্রণাম করবার নিয়ম। প্রণামান্তে গরুকে খেতে দেওয়া হয় ফল মূল - পিঠে - আঙট পাতা। নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় দুগ্ধজাত ক্ষীর - ছানা ইত্যাদি। আদিবাসীরা দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে গোরুকে মদ খেতে দেয়। নিষ্ঠাবান গৃহস্থ - কৃষক শাস্ত্রীয় আচারে গো - গোয়াল পূজা করলেও সাদারণভাবে গো - গোগৃহ পূজায় পুরোহিতের প্রয়োজন পড়েই না। গৃহকর্তা বা কর্ত্রী পূজা করেন। ধোয়া - মোছা গোয়ালঘরের একস্থানে থান - ঘট স্থান করা হয়। এই থান - ঘটই ভগবতী এবং মহেশ্বরের প্রতীক। কার্তিক অমাবস্যা কালীপূজা ও দ্বীপান্বিতা উৎসবেরও দিন। বিশেষ সম্প্রদায় এইদিনে লক্ষ্মীপূজা করেন। গো-গৃহ পূজা উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বাড়িতে তেলের পিঠে হয়। গোয়াল পূজার জাগরণ রাতে আদিবাসীগণ 'হাঁড়িয়া' সেবন করেন, মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করেন, গোরুর সঙ্গে সুখ-দুখের গল্প করেন, দেওয়ালির রাত হওয়ায় ঘরে - ঘরে প্রদীপ জ্বলে, গোয়ালেও। জাগানিয়া রাত্তিরে সকলেই জাগেন, মানুষ জাগে, গোরুও। খেলাধুলা, গানে - বাজনায় - নৃত্যে মানুষ স্বয়ং জেগে তদনুসারী সংগীতে গোরুকুলকেও জাগিয়ে রাখা হয়। গোরুর সঙ্গে গল্পো - সপ্পো হয় নাচে - গানে ঃ

ওধারে আনদিনে বরদা (বলদ) / মারিলি পিটালি বাহু হে / আজুতে (আজ) তুয়ার সঙ্গে ভাইরে/ আরে ডাঙ্গা জুড়ি (একসঙ্গে) উইঠব, / ডাঙ্গাজুড়ি বইসব/ কহে লাগর দুঃখ সুখের বাত।।

বর্ষায় বলদ শারীরিক শ্রমদানে চাষবাদে সহায়তা করেছেন, পাঁচনের প্রহার খেয়েছে, গাভী মাতৃবৎ দুগ্ধদানে মানুষকে পুষ্টিপ্রদান করেছে, উভয়ের সম্মিলনে অগ্রহায়ণ - পৌষে ঘরে উঠবে সোনার ফসল—নবান্নের দুধে - ভাতে বাঁচবে মনুষ্যসমাজ।

গোয়াল ও গোরুপূজার পর গৃহকর্তা 'শিরমণি' (শ্রেষ্ঠ) গোরুর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনায় পাঁচ পুত্র আর দশটি দুগ্ধবতী গাভি কামনা করেন ঃ

ও হিরে আশ্বিনের গুজব (শেষ) হইতে কারতিক মাসে গ / কাঁদে লাগল শিরমণি গাই গ/ আর না কান্দ শিরমণি অঁখমণি গাই গ/ তো শিঙ্গে লাগাইব তেল রে! / ওহিরে আরে ঈশ্বর মহাদেব কহিয়ে পাঠাওল/ ঘরে ঘরে লছমী জাগাওরে / আরে জাগে মা লছমী, শিরমণি জাগ আমাসিকা (অমাবস্যা) রাতি/ জাগেকা প্রতিফল দেবে মা লছমিনী/ পাঁচ পুত্র দশ ধেনু গাইরে।।

পাড়ায় - পাড়ায় সকলে যাতে না - ঘুমায় তার জন্য সকলে দল বেঁধে গাইতে গাইতে একবাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যায়। বাড়ি - ঘোরার পর হয় মজলিস ও 'বৈঠকী সঁওরাই গান' বা চাপান - কাটা অনুষ্ঠান। প্রশ্ন - উত্তরে উঠে আসে ঈশ্বর - বিশ্বাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, পুরাণ প্রসঙ্গ, শাস্ত্রজ্ঞান বা নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা। বাদ্যানুষঙ্গে থাকে ঢোল, কাঁসি, মাদল আর বাঁশি। সঙ্গে 'হাঁড়িয়া', আর নাচ। একটি গান :

প্রশ্ন ঃ কোনহি সিরিজিল ভোমোয়া পিতিমি হো?/ কোনহি সিরিজিল জাতি গাই হো/ কোনহি সিরিজিল জাতি গোয়ালা হো? /ওরিরাগে সঁপল (সমর্পণ) বাধান?

উত্তর ঃ ওহিরে ঈশ্রব সিরিজিল ভোমোয়া পিথি/ মহাদেব সিরিজিল গাইরে/ কৃষ্ণকে সিরিজিল জাতি গোয়ালা/ ওহিরাকে সঁপল বাথান।।

সঁওরাই গানের উৎসবের শেষে থাকে মশা বা 'দাদুড়' বিতাড়নের গান। জলন্ত পাটকাটি, কালো মুরগির ডিম অথবা বাচ্চা নিয়ে শুণিনও গাঁয়ের তেমাথায় এসে ডিমটা মাটিতে পুঁতে অথবা মুরগির বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে মশা বা মশার দেবতার আসার পথ বন্ধ করে দেন। ছোট - ছোট ছেলেমেয়েরা ছড়া কাটে—

ধরে মশা ধা। / নলের চোঙা পোঙায় দিয়া/ সগ্‌গে ইউঠা খা।

যে সমস্ত গোয়ালে রাত্তিবেলা গোয়াল - মশারি দেবার সুযোগ থাকে না তারা গোরুকে ডাঁক - মশার হাত থেকে বাঁচানের জন্য সন্ধ্যা থেকে তুল আগুনের 'সাঁজাল' দিয়ে রাখেন। অধিকতর ধোঁয়া করার জন্য সাঁজালে ভিজে খড় দিয়ে গাইতে থাকেন—

ধাঁরে ধাঁরে মশা ধাঁ/ গোহাল থেকে ধাঁ/ মসা সাঁধাইল গোহাল ঘরে/ আছে

সাঁজাল/ মশা বাঁদাইল তেঁতুল গাছে/ আছে ধমা/ পোঁ পোঁ শব্দ উঠেছে/ ঢাইস

(মশা মারার শব্দ) কইরে শব্দ উঠেছে/ কি মরাইলো — মশা হোঁ হোঁ হোঁ।।

জনস্বাস্থ্য - চেতনার রূপায়ণে মশা তাড়াবার গানের পাশাপাশি হালকা রঙ্গ রসাত্মক গানও পরিবেশিত হয় নিজেদের মধ্যে।

দশই গান :

সুন্দরবনে আদিবাসী সমাজ - উদ্ভুত দশই গান 'দশেরা' সম্পৃক্ত দেবী দুর্গার দশমী সংক্রান্ত সমবেত সাধন - ভজন গীত। শরৎকালে অনুষ্ঠিত দশই গানের মাধ্যমে বাটি বাজিয়ে টইনী (ভিক্ষা) মাগার জন্য 'বাটি বাজানো' বা 'টানী মাগা' গানের প্রসিদ্ধি। দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে আবশ্যিক হাঁড়িয়া - উদ্যোগের সঙ্গে চার - পাঁচ জন মিলে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি মাগন - চাল সংগৃহীত হয়। গনের যন্ত্রানুষঙ্গরূপে প্রত্যেকেরই হতে গেয়ে বাড়ি বাড়ি মাগন - চাল সংগৃহীত হয়। গানের যন্ত্রানুষঙ্গরূপে প্রত্যেকেরই হতে থাকে

কাঁসার বাটি ও লোহার শিক। বাটিগুলি গুরুভাই বা গুণিন কর্তৃক অভিমন্ত্রিত করা হয় 'বাটি সারাই' মন্ত্রসংগীতে।

গুরুভাই ছিক (শিক) পড়ে পদনী (বাটি) চিরণ চারণ দাঁত হো/ সগ্‌গে বাঁন্‌দো ইন্দ্র - চন্দ্র/ পাতালে বাঁন্‌দো দেব হো/ গুরুভাই পাতালে বাঁদ্‌দো দেব হো।।/ ত্রঁতি (এই) চিরণি বেঁতি (বেত) থর (খাড়া) ভেল পুরিযা হুঁ/ গুরুসাধন কেঁদরা বাঁশি হনু হনু (ঘন ঘন শব্দ) বাজে হোঁ।।

শিক বাটিতে পড়ল, চিকন দাঁতি ও স্বর্গের ইন্দ্র - চন্দ্র ও পাতালের দেবকে গুরুভাই বাঁধে। গুরুর সাধন - শক্তিতে সরুবেত খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর ভাঙা বাঁশি ঘনঘন বাজে।

পুরুলিয়া - রাঁচিতে গুরু - শিষ্যের প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে শুরু হয় দেবীদুর্গার বন্ধনা ও মূল গান। তারই উত্তরাধিকার সুন্দরবনের জল - জঙ্গলের প্রতিবেশে পরিবেশিত নিজস্ব ঢং -এ।

দশঞকা (দশহাতের) ঝলমল দেবীরে দুর্গা, / মায়েক ঝললম খেলারে খেলবে। ম্যাঁয়তো খামু দেশে বোগিয়া—/ ম্যাঁয় তো খানু লঙ্গর (নগর) শহর বুলে (বেড়াতে) হো।/ লঙ্গর শহর বুলে চেলা কিনা কিনা পাওলে?

ম্যাঁয়তো পালু আড়োয়া (আতপ) চাল কাঞ্চ (কাঁপ) দুধ লাগিয়া, / ম্যাঁয় তো পালু সিথাকে সিঁদুর, কিয়া ভুরভুর সিন্দুরা।/ লাঙ্গল শলহ বুলে চেলা কিনা কিনা পাওলেৎ? আর সিন্দুর আহো সিন্দুরা রাঙা মাটি সিন্দুরা/ গোরুবাবা রোপল (রোপন) সিন্দুরা/ গোরুয়ানী মা নিদি জাগরণ। তুলসী তুলসী ভাইকে রোপল তুলসী?/ গোরু রোপল তুলসী।/ গোরুয়ানী মা নিদি জাগরণ।

গুরুকে বা আঙ্গনাই (আঙ্গিনা) তুলসী চাঁওয়া/ ডাল কিউসে হিলে বো।/ যখন আওয়ে গোরু গোরুয়াইন,/ তখন ডাল হিলে (দুলে) হো।।

গানের কথায় বলা হয়েছে— দেবীর দুর্গার ঝলমলে রূপের মতো হাতের অস্ত্রও। গুরু ও শিষ্য যোগী হয়ে দেশে দেশে নগর - শহর ঘুরে ঘুরে কী পেলে? —আতপ চাল, কাঁচা দুধ, কেয়াগন্ধি। সিঁথির সিঁদুর। আর কী পেলে? —গুরুবাবার তৈরি —রাঙা মাটির সিঁদুর, গুরুমা নিদ্রামগ্ন, গুরুবাবা ও গুরুমা এলে তুলসী ডাল দুলে ওঠে।— গানের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জন 'সান্ধ্যভাষা' -প্রায়। কিন্তু গ্রামীণ শিল্পীর মানসিক আবেদন লোকসংগীতে অনন্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

টুসু পূজার গান :

কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার আদিবাসীদের একটি মুখ্য উৎসব টুসু পূজা। পৌষ- সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত টুসুপূজা উৎসবে লক্ষ্মীর অনুরূপ পুতুল - প্রতিমা মাটির সরাই -র উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপকরণে নূতন ধানের তুষ বা ধান, মূলাফুল, সরিষাফুল, গাঁদাফুল, গোবর নাড়ু, দুর্বা, বেগুনপাতা, মিষ্টি, পার্বণের পিঠে, হাঁড়িতে থাকে। প্রতিমার পাশে গর্তটিতে দেওয়া হয় ফুল, ধান, দুর্বা ইত্যাদি। সূর্যোদয়ের পূর্বেই টুসু বিসর্জন হয়। গোবর - নিকানো ঝকঝক তক্‌তক্ সাঁওতাল পাড়া সুখ -শান্তি - আনন্দে মেতে ওঠে টুসুলক্ষ্মীর আরাধনায়। বাংলার সুপ্রাচীন কুমারীব্রত তোষ - তোষলা, তিষ্যা অথবা পূষ্যা নক্ষত্রীয় সম্পর্কিত শস্যোৎসবের সঙ্গে তুষু বা টুসুপূজা - উৎসবের সাদৃশ্য নিবিড়তা বর্তমান। গানই টুসু পূজার মন্ত্র। দেবী টুসুকে কেন্দ্র করে সারা রাত্তির মেয়ে - পুরুষ সকলে মিলে গান করে পারিবারিক তথা সামাজিক সম্মেলনে। টুসু - বন্দনা মাহাত্ম্য - প্রচার থেকে শুরু করে পারিবারিক - সামাজিক সুখ - সমৃদ্ধি - সমস্যা - যন্ত্রণা, গৌরীদান প্রথা, সতীন - সতা, বাল্যবিবাহ, অভাব, দারিদ্র, নৈতিকতা, দাম্পত্য খুনসুটি, স্থানীয় চাঞ্চল্যকর কাহিনী ইত্যাদি কথা দিয়ে গাঁথা গানের ডালি উপহার দেওয়া হয় টুসুকে। পুকুর বা নদীতে বিসর্জন - বিদায়লগ্নে টুসুর থাকার জন্য অনুনয় - বিনয় পারস্পরিক ব্রতী - ব্রতিনীদের মধ্যে টুসুর গুণাগুণ বিচার - বিতণ্ডা সামান্য হলেও পূর্ব - আকাশের রক্তিমাভায় তা মিলিয়ে যায়। টুসুক 'বন্দনা গান' শুরু হয়—

টুসু ঠাকুর মা গ/ আল্‌তাপরা/ গা গ/ সোহার খাটে হেলান দিচ্ছে/ রূপার খাটে পা গ।।

গানের পূজার উপাচার প্রসঙ্গ ব্যক্ত—

কলা দিলাম সারিসারি/ বেগুন দিলাম দু-বাড়ি/ এবারক যে গো মা টুসু/ আর কিছু না দিতে পারি।।

সন্ধ্যারাতি— তেল দিলাম সলতে দিলাম/ এল ভগবতী।/ গাই এল বাছুর এল/ এল দুর্গা - সতী/ একে একে লে মা সন্ধ্যা/ লক্ষ্মী - সরস্বতী।।

টুসুগানে ঝুমুর আঙ্গিকে কৃষ্ণভক্তি—

ওটুসু নদীর ধারে গাই বিয়েছে/ নাম দিয়েছি হাসি গো/ তারে আমি কিনে দেবো/ পিতল বাঁধা বাঁশি/ বাঁশি নেই বাঁশি নেই সারুল গাছের আগা/ বিনাফুঁকে বাজে বাঁশি/ ওটুসু, বলে রাধা - রাধা।

রাজনীতি প্রসঙ্গ— যুক্তফ্রন্টের আইন হ'লো/ কংগ্রেস পার্টি লাই বটেক/ কলিকালের মেয়ে ছিলে/ হাতে ঘড়ি দিয়াছেক।।

ঝুমুর আঙ্গিক বর বিদায়ে গান—

কলকাত্তাতে দেখে এলাম/ কাকেতে গান জুড়েছে/ শিয়াল ভায়া জুড়ি বাজায়/ ভুতুম প্যাঁচা ল্যাজ নাড়ায়/ ডাঁসা নদীতে লঞ্চো চলে/ জোড়া ইঞ্জিন বাজায় গা/ বার হয়ে দেকবি টুসু। তোর বর চলে যায় গো।।

টুসু গানে মেয়ে না - পাঠানো প্রসঙ্গ—

আমার লক্ষ্মী একটি মেয়ে/ মানবাজারে শ্বশুরঘর/ বাঁধের আড়ে, কলসী রেখে/ পালিয়ে এল বাপের ঘর।/ আসুক জামাই লাগাব ঝগড়া/ কথার ফান্দে দেবো ব্যাগড়া/ টুসুমাকে আর পাঠাবো না।।

নদী - পুকুরঘাটে টুসু বিসর্জনে তরজা—

মোদের টুসু কাপড় কাচে/ সোনা জরি লয়ে গো/ তোদের টুসু দেখে বলে/ কোন্ গেরোস্থের মেয়ে গো। মোদের টুসু ভাজাভাজে/ শাঁখা ঝলমল করে গো তোদের টুসু রান্নাঘরে/ মাছি ভন্‌ভন্ করে গো।/ মোদর টুসু এমএ, বিএ/ ইংরেজি পড়ায় ইস্কুলেতে/ তোদের টুসুর বাঁশের কলম/ নামটি লেখা তালপাতাতে।

কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও রূপকের আড়ালে লোকায়ত ঐতিহ্যের এই স্মারকছত্রে মুগ্ধ মুখরিত হয়ে ওঠে জীবনদর্শন।

ঝুমুর গান :

ছোটনাগপুর, রাঁচি, সাঁওতাল পরগনা, মধ্যপ্রদেশের মতো সুন্দরবনেও ঝুমুরের ব্যাপক প্রচল ও গানের বিষয়বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। উৎসব কেন্দ্রিক নৃত্যগীত না হলেও উৎসব বা অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় ঝুমুরদ্ধক নৃত্যগীত প্রচলিত। আদিবাসী সমাজ - জীবনের টুকরো চিন্তা - চেতনা, লৌকিক প্রেম - ভাবনা ও ভালোবাসা, সামাজিক আচার বিচার, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রতিবেশ, নৈতিক কথা, রূপকথা, নৈসর্গিকতা, জীবন- জীবিকা, রাধাকৃষ্ণলীলা, রামলীলা উপজীব্য স্বল্পায়তনের ঝুমুর গানগুলিতো। 'ঝুলন যাত্রা' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বল্পদৈর্ঘ্যের গানও শ্রুত হয়। ঝুমুর নৃত্য - গীতি আদিবাসী সমাজে মাদল ও বাঁশির সঙ্গে খোল করতালও ব্যবহৃত হয় সুন্দরবনে। আদিবাসী সমাজের প্রচলিত ঝুমুরের একটি—

টাঙ্গিয়া ঝলকায় লাগর যাছন গ।/ বাইরলে কুক্কড়ী (মোরগ) ডাকে/ সোজা গেলেন কুলীর বাটে চুটিয়া ফুঁকিয়া গ।/ ভাত খাইবার বেইলা হল্ল/ একখনো লাগর না আইল্ল/ কোন বাটে কেন্দ খাচ্ছেন গ,/ মহুলবনে গ।।

মোরগ ডাকা ভোরে পাতার বিড়িটানতে টানতে টাঙ্গি ঘাড়ে প্রাণপতি কাজে গেছে, ভাতখাবার বেলা হল, তবু ফিরল না।

সুন্দরবনে ঝুমুরের পাঁচটি বিভাগ বর্তমান।

ক. দাঁড়শালিয়া ঝুমুর :

অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে নাচগান চলে 'দাঁড়শালিয়া' ঝুমুর। পুরুষদের নৃত্যগীত, যদিও, নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। নাচের সময় প্রত্যেকে পিছন দিক থেকে পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর বাহু আকর্ষণ করে থকে। পৌরাণিক বিষয়, বিশেষ করে রামলীলা অথবা রাধাকৃষ্ণলীলা দাঁড়শালিয়ার বিষয়। গানগুলিরও দুটি স্তর। প্রথম স্তর রূপকধর্মী। বিলম্বিত লয়ে গীত হয়ে দ্বিতীয় স্তর রং। দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। একটি গান—

কাঁহাসে উবজলা (তৈরি মাটিকে মিরদঙ্গিয়া (মৃদঙ্গ) গড়ল সুন্দরী? কাঁহাকে উবজলা গীহিত সব সড়লো (আরম্ভ) সুন্দরী?

বারান্দা হে উবজলা মাটিকে নিরদঙ্গিয়া গড়লো সুন্দরী।

বরণ্ডাহে (গীতমন্দির) উবজলা গীত গ ছাড়লো সুন্দরী

কোথা থেকে মৃদঙ্গ তৈরি ও কোথা থেকে গান লিখে গাইতে আরম্ভ করলে সুন্দরী? সুন্দরী বারান্দার মাটি দিয়ে মৃদঙ্গ গড়েছে ও গীতমন্দির থেকে গান রচনা করে গাইতে আরম্ভ করেছে।

খ. নাচনী ঝুমুর :

'নাটনী ঝুমুর' রাত্তিরে বৈঠকী আসরে, বিবাহ বাসরে কিংবা পাল - পার্বণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত মহিলা - কেন্দ্রিক নৃত্য - গীতানুষ্ঠান হলেও কখনও বা পুরুষ মহিলা সেজে অংশগ্রহণ করে। নাচনী ঝুমুরেরও দুটি স্তর। প্রথমটি দেববন্দনা এবং দ্বিতীয়টি নাচনীর নাচ। হাঁড়িয়া উন্মত্ত দর্শকও শ্রোতৃমণ্ডলী মাদল - বাঁশির তালে - তালে নাচনী ঝুমুরের আদিরসাত্মক গানের সঙ্গে দেহভঙ্গি ও মুদ্রার নিগূঢ়ার্থ উপভোগ করে। একটি গান—

পেরথমে বন্দনা করি দেবী সরস্বতী / তাঁহার পদযুগলেতে জানাই প্রণতি।

তারপরে বন্দনা করি গুরুদেবের পায়ে/ মাতাপিতা পরমগুরু রাখিব মাথায়।

বৃথাকুঞ্জ সাজালাম/ রাত্তির বসে জাগিলাম/ কোথা রইল কার সনে/

না আইল মনচোর/ প্রেমবিষে অঙ্গজ্বর/ প্রিয় মোর না আইল কাছে।। এমন মধুরাতে প্রিয় গো/ মোর না আইল কাছে।।

শিমূল ফুল লালে খানিক/ পুরুষ মন শঙ্খবণিক/ এজীন রাখবে। কী বলে।। যদি

আসে কালো সোনা / সহইরে তাসের করিস মানা/ খুঁজতে বলিস যমুনার জলে।।

গ. খেমটা ঝুমুর :

'খেমটা' অর্থে সংগীতে তাল; সংগীতে তাল; যদিও সুন্দরবনে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ঝুমুরের খেমটানাচ আদিবাসীদের নৃত্যগীত। নর্তকীগণ মূলত স্ত্রী হলেও পুরুষেরা মেয়েদের পোশাক পরে নাচে। গোটা আসর জুড়ে নর্তকীরা ঘুরে ঘুরে নাচে - গায়, আরে দাহাররা সুরে সঙ্গত করে। মাদল - ধামসা - বাঁশি বাজে। হাঁড়িয়ার সহাবস্থান আবশ্যিক। চটুল নৃত্যের বিচিত্র মুদ্রায় শ্রোতারা উপচেপড়া মত্ততায় বাহারি চিৎকার ছুঁড়ে দেয় 'ঘুরে - ফিরে।' একটি গান—

শুকনো কাঠিতে ফুল ফুলিল/ কেমনে তুলিব ডামিল লো/ ও ডামিল তো নিলে না।।

ওই কতরঙ্গের ফোটা ফুল/ লিবে কোন ফুল গো।/ এই যৌবনের বাগানে

ফুল / তুলিতে ছরম লাগে গো?/ ও ডালিম তো নিলে না।।

উথালি পাথালি সাঁঝের বন/ কালো ভ্রমর উড়ছে ফিরছে করছে গুনগুন।

ও ডালিম তো নিলেম।।

ঘ. আধ্যাত্মিক ঝুমুর :

ভবজলে সাঁতার দিই সাতসকালে/ গাঙের মাছ না বিন্ধে সাঁই সংসারের হাসে।।

ট্যাংরা পুঁটি মাগুর শোল/ পাঁকাল মাছের মন পাগল/ ঘুইরা ঘুইরা পরবি শেষে বাঁধা আটলে।।

রুই কাতলা মৃগেল কই/ মনের ময়লা ঘুচল কই/ হিসাব - নিকাশ করবে কে সাঁই জীবন ফুরালে।।

ঙ. ব্যাঙ্গাত্মক ঝুমুর :

বধূ রমণীর রস কত খাবে।/ রমণীর রস সারাবছর হয়/ তাল খেজুর আঁখের রস নয়/ ঝুনো নারকেলে বেলের সরবত বানাইও। কিংবা— হে, হে বেল পাকিলে কাকের কী?

জিনিষ নিব পয়সা দিব/ ধারে কেনা যায় না পরান।/ শিমুল গাছের মগডালেতে/ কাজল ভ্রমরা আগুয়ান।।

পুকুরঘাট নদীর বাঁধ/ কদম্বেরই তালাতে যমুনা বইয়ে যায়/ মন মাঝিয়ান নেশায় বিভোর/ টইলা টইলা পড়ে রাধাসুন্দরী গায়।।

গান কে রচনা করেছেন, সুর সংযোজনাইবা করেছেন কে, তা কেউই মনে রাখেন না। সমাজ স্বীকৃত সম্পত্তি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে আঞ্চলিক - ভৌগোলিক ভূখণ্ডের বহতা নদীর মতো সুরে ছন্দে স্বচ্ছন্দ।

করমগান :

সুন্দরবন আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতিতে করমপূজা একটি আনন্দমধুর উৎসব ও নৃত্যগীতানুষ্ঠান। সুন্দরবনে সুন্দরীবৃক্ষের মতোই 'করম' বৃক্ষেরও অনুপস্থিত জনিত কারণে 'কদম্ব' কিম্বা 'হাবাল' বৃক্ষকেই মান্যতা দেওয়া হয়, বালিমাটি ভর্তি একটি নূতন মাটির সরা বা মালসায় ছড়িয়ে দিতে হয় ধান, যব, গম, কলাই, সরষে, হলুদ। একটু জল ছিটিয়ে দিলে দু-চারদিন পর অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। বহুক্ষেত্রে মালাসায় সিদ্ধ ধান রাখা হয়। কৃষি দেবতা করমঠাকুরকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎসব ভাদ্র শুক্লা পক্ষের একাদশী তিথি অথবা ভাদ্রমাসের যে কোনো দিন। অর্থাৎ পুরো ভাদ্রমাসই করমপূজার সময়। নির্দিষ্ট দিনে কদম্বের ডাল কেটে এনে উঠোনে পুঁততে হবে। পাশে রাখতে হবে পূর্বে উক্ত অঙ্কুরিত শস্যের মালসা বা সরা। পূজা - নাচ - গান। মুরগি বলে আস্তে করমকাহিনী শোনা এবং পরদিন ভাসান বা বিসর্জন।

করম বা কদম্বডাল কাটার বিধি - নীতি বিশেষ ধরনের। গাঁয়ের প্রধান যে কেউ পৌরোহিত্য করবেন। পবিত্র পুরোহিত উপবাসে থেকে মূলকরম বা কদম্ব বৃক্ষের গোড়ায় স্থাপন করবেন নূতন গামছা। আর পাঁচ সিকি পয়সা। বৃক্ষ প্রণামান্তে কর্তিত ডালের গায়ে নূতন গামছা জড়িয়ে কাঁধে করে এনে আখড়ার উঠোনে পুঁততে হবে। করম পূজার সময় কুমারী কন্যারা করমগাছের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত করবে আর পুরুষেরা বাজাবে মাদল। কিছুটা মঙ্গলকাব্যের আদলে গ্রথিত যমজ ভাই ধরমা - করমার কাহিনী মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও কৃষি সূচনাকারী কাহিনী। করম ডাল খরমঠাকুরের প্রতীক, পৃথিবীর প্রতীক সরা - মালসা ভরা বালিমাটি, শস্যের প্রতীক অঙ্কুরোদ্‌গম বীজ।

করমঠাকুর কেন্দ্রিক করম গানই উৎসমূল হলেও সমাজিক প্রসঙ্গ, রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, রঙ্গব্যঙ্গ বিষয়বস্তু রূপে বিবেচিত। সুন্দরবনে ভাদ্র মাস বড়ই অভাবের মাস। প্রাক্ শারদীয়ার এই সময়ে কাজ থাকে না, উপার্জনও হয় না। কিন্তু উৎসব বন্ধ থাকে না। ঘরে হাঁড়িয়া পিঠে ইত্যাদি আকচারই হয়। সারারাত ধরে চলে নৃত্য - গীত। মাদলের তালে তালে কুমারী মেয়েরা নাচে - গায়। একটি গান—

করম কাটি করম কাটি আখড়ায় স্থান করি/ সবে জারি দিল গো রেশমের বাতি/ হায়রে করমক বাতি।/ হামাদের করম রাতি/ নাচানাচি মাহামাহি।।/ শিশিরে কিধান ফলে বিনা বরিষণে/ শোনা কথায় মন ভুলে না বিনা দরশনে।।/আমাদের করম রাজা ঘরে আসিছেন।/ কালি গাইয়ের দুধ দিয়া করমপিঠা খাবেন।

করমের রঙ্গব্যঙ্গাত্মক গানগুলি লঘু সুরের দ্রুতলয় যুক্ত আদি - রসাত্মক। একটি প্রয়াস—

এক যে ছিল বেঁড়ে গুরু নামটি তার হাঁসা/ চারমাস বর্ষা গলে তেঁতুলতলায় বাসা।/ কত সবই গো কেঁদলা বউ -র থালা।।/ বাণিজ্যে গেলাম বাজার গেলাম আনলাম কিনে নাড়ু।/ নাড়ু খেয়ে কেঁদলা বউ আমার মাথায় মারে খাড়ু।

করমে রাধাকৃষ্ণ লীলার একটি গান :

নব জলধর ঘটা তরুতলে আছে একটা/ সখিরে চাহিলে নয় ফিরে না।।/ অপরূপ রূপ রাশি শিরে চূড়া করে বাঁশি/ সখিরে মুখে হাসি মুখে মিলে না।।/ কি ক্ষণে তার হইল দেখা মনে জাগে বড় ব্যাথা/ সখিরে ভুলাইলে যে মন ভুলে না।।/ ধৈরজ ধরতে নারি তিলেক না সরতে পারি/ সখিরে কাঁদে পরাণ মন মানে না।।

রাত্রিশেষে বিসর্জনের বাজনা বাজে মাদলে। রাত - জাগানিয়া ঢুল ঢুলু, চোখ, ক্লান্ত শরীর। কদম্বশাখা ও অঙ্কুরিত বীজের সরা - মালসা মাথায় তুলে নেন প্রধানেরা, কখনও বা কদম্ব শাখা কাঁধে তুলে নেন। পুকুর বা নদীতে হবে করম - কদম্বের ভাসান। বৃদ্ধ - বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, ছেলেমেয়ে। বিদায়বেলাতে গানের বিরাম নেই।

কাঠিনাচের গান :

যৌথ নৃত্যকর্ম কাঠিনাচের গান গাওয়া হয় দুর্গাপূজার প্রাক্‌কালে। সুন্দরবনে আদিবাসী সমাজে মাদলের তালে দশ - বারো জনের নৃত্যগীতানুষ্ঠান আশ্বিনে আগমনী গানের পর্যায়তুল্য। কাঠিনাচ লোকায়ত, যদিও রূপকর্ম উচ্চ পর্যায়িক। একজন মূলগায়েন, একজন সহকারী গায়েন, একজন রংদার। রংদারের হাতে থাকে বাঁশের 'রেজাঁ'। রেজাঁর মধ্যে একটি অ-সমানি কাঠি ঢুকিয়ে 'চরর' 'চরর' শব্দ তুলে নানা, অঙ্গভঙ্গিসহ নাচতে নাচতে 'চিহো' শব্দ সংহত করে। নাচের দল ছোট ছোট কাঠি হাতে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ায় ও নাচ - মাদলের তালে তালে সামনে নুয়ে ডানহাতের লাঠি দিয়ে সঙ্গীর বামহাতের লাঠিকে মৃদু আঘাত স্পর্শ করলে আওয়াজ ওঠে। কাঠির শব্দের তালে তালে একপা এগিয়ে ও দুপা পিছিয়ে নাচ হয়। মহিলারাই মুখ্য হলেও পুরুষেরা মেয়েদের সাজ - পোষাক পরে নাচে। কাঠিনাচের মাধ্যমেও আশ্বিনে গ্রামে 'মাগন' সংগ্রা হয়। মহারাষ্ট্রে এমনতর নৃত্যের অঙ্গ কাঠিনাচ রাসনৃত্য পর্যায়ের, আবার প্রাচীন মানুষের যুযুধান বৃত্তি ও আত্মরক্ষার সূক্ষ্মভাব কাঠিনাচের প্রেক্ষাপটে বর্তমান।

কাঠিনাচের গানগুলি প্রায়শ কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা বিষয়ক। রামলীলা বিষয়ক একটি গান—

উপরি গুরুজির ছটা নিচে তাতা বালি গ/ আর না চলিতে পারে সীতা/ ওকি শুনে গ মরমের সই/ সীতার প্রাণ করিছে বিকলি।।/ রাম ধরে তরুর ডাল, লক্ষ্মণ তাহার শিরে ভাল/ আর চলিতে না পারে সীতা করিছে বিকলি।

রাম -লক্ষ্মণ - সীতার বনবাসকালে যাত্রাপথে সীতার কষ্টলাঘবের কথা বলা হয়েছে গানে। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বিষয়ক একটি গানে বলা হয়েছে—

ধেনু জড়ো করো ছিদাম সন্ধ্যানামে মাঠে গ
তুমার লাগি বলাই দাদা দাঁড়িয়ে আছে পথে গ।
আমার কানাই দাদার লাগি সবাই দাঁড়িয়ে আছে পথে গ।
তুমার লাগি সুদাম দাদা দাঁড়িয়ে আছে পথে গ
আমার কানাই দাদার লাগি সবাই দাঁড়িয়ে আছে পথে গ।

গানগুলি শুরু হয় বিলম্বিত লয়ে, নাচও চলে ধীর লয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে গানগুলি দ্রুত লয়ে গীত হবার সঙ্গে সঙ্গে নাচের তালও

ও দ্রুত। কিন্তু, এই বাহ্য যে, সুরের জাদুতে অতলস্পর্শী পবিত্রতার দ্যোতক হয়ে উঠেছে কাঠিনাচের গানগুলি।

সারুলগান :

সুন্দরবনে আদিবাসী সমাজে সারুলগান ও নাচ নববর্ষের গান, নূতন ফুল ফলের গান। নিদাঘ চৈত্রের বিদায় লগ্নে প্রথম বৈশাখে একই সঙ্গে পালিত হয়। নববর্ষের আবাহন ও বর্ষ - বিদায়ের স্মৃতি রোমন্থন উৎসব। এই উৎসবে স্বর্গত পিতা - মাতার উদ্দেশে নিবেদিত হয় শ্রদ্ধাতর্পণ। বিলম্বিত হয়ে ঢোল - মাদলের বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ নৃত্যগীত। বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির পরিচিত পুষ্প - পত্রাদিই সারুল উৎসবের উপচার হিসাবে আহরিত হয়। পুষ্পে - পুষ্পে মৌমাছি, শাখে শাখে পাখির কলতানে মুখর প্রকৃতি রাজ্য। গোবর নিকানো আঙিনা নারী - পুরুষের অংশগ্রহণে পূর্ণ হয়ে ওঠে হাঁড়িয়ার মৌতাতে। সাধারণত প্রৌঢ়াগণ পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন। ডালি ভরে তুলে আনেন মঞ্জরিত নিমফুল, আম্র মঞ্জরী, খলসীফুল গুচ্ছ। নিবেদিত হয় নতুন কাপড়, সিঁদুর ও মোরগ। কিশোরীরা পরে হলুদ ছোপান শাড়ি, হাতে কাঁচের চুড়ি আর পায়ে আলতা। বর্ষবিদায় আর নববর্ষের নৃত্যগীতে মূর্তি হয়ে ওঠে নরনারীর প্রেমচেতনা, দয়িতের জন্য প্রতীক্ষা, মিলনে ব্যর্থতার বেদনা। সময় বহতা নদীর প্রায়। কালের অমোঘতায় তার বিপুল বৈচিত্র। গানে বলা হয়েছে—

হায় হায় সময় রে/ সময় যেন সেন তান (স্রোতের টান)/ সময় বিরিতান/ (বৈচিত্রময় টানা)।/ হায়রে হাঁ তাই।/ যেসম বিণ্ডা (খড়ের তৈরি)/ তেসম চাণ্ড (কলসী) / যেসম চাণ্ড তেসম বিণ্ডা/ হায়রে হায় সমর রে।।

প্রকৃতির পত্র - পুষ্প - ফলে উদ্দাম সৌন্দর্যে আপনাকে বিকশিত করে। নরনারীর মনও উন্মত্ত। প্রেয়সীর জন্য মন উচাটন, একাকিত্বের বেদনা গানে গানে সুন্দরবনের গাছ - গাছালি পাখ - পাখালি আর গ্রামগুলির সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যায় নৃত্যগীতে। একটি গান—

নিমডালে ফুল ফুটেছে / খলসী বনে মৌপোকা/ মোর বঁদুয়া কুথা আখন/ কুথা পাব তার দেখা।।/ সখীরে মনের বেদন গ্যালা না/ আজকে মেয়েরা সারল হবে/ আমগাছেতে কোকিল ডাকে বঁধুয়া এল না।।/ আজ গ মোদের সারুল হবে/ গোবরে লোপি ঘর/ হলুদ শাড়িজ কিনতে বলেছি/ আসবেক গ মোর নাগর।।/ বেলা ডুবল কালিনগরের গাঙে/ কাস্তে চোরা বালি উড়ে যায়। কখন আসবেক মোর নাগর/ সময় বইয়া যায়, হায় রে হায়।।/ ভোলাখালিক গাঙেতে বান আইল/ সারুল নাচা হলেক না/ খলমের ফুলের মালা শুকাল নাগর ভ্রমর এলেক না/ হায়রে হায়.../

গানগুলির বিষয়বস্তু সুন্দরবনের গহিন ভাব ব্যঞ্জনা নিহিত এক - একটি নিটোল মুক্তা। সমাজ - সংস্কারের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করার স্পর্ধিতা ব্যতিক্রম মহাকালের বিস্মৃতিও গ্রাস করতে পারেনি। এ এক আশ্চর্য প্রাণের সংগীতমুখর উৎসব।। লাগাইয়া/ ওরে ভক্তি ভাবের গাব লাগাও রে/ নায়ে জল উঠবে না বাইয়া।।

বাংলার লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ লোকগান সুন্দরবনের জনজীবন থেকে নীরবে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা করায়ত্ত জীবনে লোকসংস্কৃতির এই ধারাটিও লুপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমান প্রসঙ্গে বিপুল ও বিচিত্র গানের পসরা থেকে কয়েকটি মাত্র নমুনা পরিবেশিত হল।

যে আলোর উৎস ধরে :

১। লোকসাঙ্গীতিকী - বুদ্ধদেব রায় — ১৯৮৭।

২। বাংলার পীর সাহিত্যের কথা - গিরীন্দ্রনাথ দাস — ১৯৭৬।

৩। দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র - সুভাষ মিস্ত্রী — ২০০০।

৪। উত্তরবঙ্গ লোকগান সংবাদ : লোকনাট্য সংখ্যা ২,৩।

৫। ত্রিনাথের উৎস সন্ধানে - সুভাষ মিস্ত্রী —২০০১।

৬। অতএব, জানুয়ারী — ২০০৩।

৭। লোকশ্রুতি ১৬ - ২০০০।

৮। লোকসংগীত ও গণসংযোগ - সুভাষ মিস্ত্রী - ১৯৯৯।

৯। নিমগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র ১ ম সংখ্যা — ২০০৫।

১০। শ্রীখণ্ড সুন্দরবন; সম্পাদক দেবপ্রসাদ জানা — ২০০৫।

১১। বর্ণালী বসিরহাট ৩৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা —২০০৭।

১২। ক্ষেত্রানুসন্ধান : গোসাবা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, ও ক্যানিং থানা এলাকার গ্রাম্য — ১৯৯৯ - ২০০১।

লেখক পরিচিতি : চারুচন্দ্র কলেজের বাংলা প্রধান অধ্যাপক। বহুবিধ গ্রন্থ রচয়িতা।